সিঁদুরচরণ

(গল্পগ্রন্থ – ক্ষণভঙ্গুর)

সিঁদুরচরণ আজ দশ-বারো বছর মালিপোতায় বাস করচে বটে কিন্তু ওর বাড়ি এখানে নয়। সেদিন রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে সিঁদুরচরণ কোথা থেকে এসেচে তা নিয়ে কথা হচ্ছিল। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মশায় তামাক টানতে টানতে বললেন—"কে, সিঁদুরচরণ ?ওর বাড়ি ছিল কোথায় কেউ জানে না, তবে এখানে আসবার আগে ও খাবরাপোতায় প্রায় দশ বছর ছিল। তার আগে অন্য গাঁয়ে ছিল শুনিচি, গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোই ওর পেশা।"

পেশা হয়তো হতে পারে, কারণ সিঁদুরচরণ গরিব লোক।

জীবনে সে ভালো জিনিসের মুখ দেখেনি কখনো। কেউ আপনার লোক ছিল না, সম্প্রতি মালিপোতাতে এসে বিয়ের চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীলকে কেউ মেয়ে দেবার আগ্রহ দেখায়নি। মালিপোতার এক বুনো মালি আজকাল ওর সঙ্গে একত্র স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করে। তার বয়স ওর চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। দেখতে মোটাসোটা, মিশকালো রং, মাথার চুলে এখনো পাক ধরেনি বটে তবে ধরবার বেশি দেরিও নেই। বুনো বলে এদেশে সেইসব কুলি-মজুরের বর্তমান বংশধরদের, যারা একশো বছর আগে নীলকুঠির আমলে রাঁচি, হাজারিবাগ, গিরিডি, মধুপুরপ্রভৃতি থেকে এসেছিল নীলকুঠির আমলে মজুরি করতে, এখন তারা বেমালুম বাঙালি হয়ে গিয়েচে—ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার সব রকমে। পূর্বপুরুষের বোংগা পুজো ভুলে গিয়েচে কতকাল, এখন হরিসংকীর্তন করে ঘরে ঘরে, মনসা-পুজো, ষষ্ঠী-পুজো করে, কালীতলায় মানত করে।

এখন যদি এদের জিজ্ঞাসা করা যায়—তোরা কোন্ দেশ থেকে এসেছিলি রে ?তোদের আপনজন কোথায় আছে ?

ওরা বলবে—তা কি জানি বাবু !

—পশ্চিম থেকে এসেছিলি, না ?

—শুনেচি বাপ-ঠাকুরদার কাছে। ওদিকের কোথা থেকে আমাদের পাঁচ-ছ' পুরুষের আগে এসে বাস করা হয়। সে সত্য যুগের কথা।

সিঁদুরচরণ এ-হেন বুনো মালিকে নিয়ে দিব্যি ঘর করতে থাকে। তার নাম কাতু—হয়তো 'কাত্যায়নী'র অপভ্রংশ হবে নামটা। কিন্তু ওর অপভ্রংশ নামটাই অন্নপ্রাশনের দিন থেকে পাওয়া—ভালো নাম তাকে কেউ দেয়নি।

সিঁদুরচরণ পরের গোরু চরিয়ে আর পরের লাঙল চষে জীবনের চল্লিশটি বছর কাটিয়ে দেওয়ার পরে বিঘে তিনেক জমি ওটবন্দি বন্দোবস্ত নিলে। তার জমিতে পরের বছর দশ মণ পাট হল, সেবার বাইশ টাকা পাটের মণ। পাট বিক্রি করে সেবার এত পেলে সিঁদুরচরণ, অত টাকা একসঙ্গে তার তিন পুরুষে কখনো দেখেনি। দশ টাকার নোট বাইশখানা।

কাতুবললে—হ্যাঁ গো, দশ হাত ফুলন শাড়ির দাম কত ?

—কেন, নিবি ?

—দাও গিয়ে এবার। অনেকদিন যে ভাবচি। বড্ড শখ।

—এই বয়সে ফুলন শাড়ি পরলি লোকে ঠাট্টা করবে না ?

কথাটা কিঞ্চিৎ রূঢ় হয়ে পড়ল, মনে হল সিঁদুরচরণের। অল্প বয়সে ওকে দেবার লোক কে ছিল ?আজ বেশি বয়সে সুবিধে যখন হলই তখন অল্পবয়সের সাধটা পূর্ণ করতে দোষ কি ?তারপর ঘোষেদের দোকান থেকে একখানা ফুলন শাড়ি শুধু নয়—তার সঙ্গে এল একখানা সবুজ রঙের গামছা।

কাতু খুশিতে আটখানা। বললে—শাড়িখানা কি চমৎকার—না ?

—খুব ভালো। তোর পছন্দ হয়েচে ?

—তা পছন্দ হবে না ?যাকে বলে ফুলন শাড়ি !

—আর গামছাখানা কেমন ?

—অমন গামছাখানা কখনো দেখিইনি। ও কিন্তু মুই ব্যাভার করতি পারব না প্রাণ ধরে। তাহলি খারাপ হয়ে যাবে।

—খারাপ হয় আবার কিনে দেব। আমার হাতে এখন কম ট্যাকা না !

সেদিন কামার-দোকানে বসে তিনকড়ি বুনোর মুখে কালীগঞ্জে গঙ্গাস্নান করতে যাবার বৃত্তান্ত শুনল সিঁদুরচরণ। বাড়ি এসে কাতুকে বললে কাতু, তুই থাক্, আমি দুদিন দেশ বেড়িয়ে আসি—

—কোথায় যাবা ?

—একদিকে বেড়িয়ে আসি—

—আমারে নিয়ে যাবা না ?

—তুই যাস তো চল্—ভালোই তো—

দুজনে জিনিসপত্র একটা বোঁচকাতে বেঁধে তৈরি হল। কিন্তু যাবার দিন কাতুর মত বদলে গেল হঠাৎ। সে বললে—তুমি যাও, আমি যাব না। গোরুটার বাছুর হবে এই মাসের মধ্যে। যদি আসতে দেরি হয়, বাছুরটা বাঁচবে না।

—তুই যাবিনে ?

—আমার গেলি চলবে কেমন করে ?বাছুরটা মরে গেলি সারা বছরটা আর দুধ খেতি হবে না। তুমি যাও, আমি যাব না।

সুতরাং সিঁদুরচরণ একাই রওনা হল বোঁচকা নিয়ে। রেলগাড়িতে সামান্যই চড়েচে সে, একবার কেবল বেনাপোল গিয়েছিল গোরুর হাট দেখতে। সে জীবনে একবারমাত্র রেলগাড়ি চড়া। পরের চাকরি করতে সারা জীবন কেটেচে।

স্টেশনে গিয়ে রেলে চড়ে যেতে হবে। সিঁদুরচরণ কাপড়ের খুঁটে শক্ত করে গেরো বেঁধে দুখানা দশ টাকার নোট নিয়েচে। কেউটেপাড়ার কাছে পাঁচু বুনোর দো-চালা ঘর রাস্তার ধারে। ওকে দেখে পাঁচু জিজ্ঞেস করলে—ও সিঁদুরচরণ, কনে চলেচ এত সকালে ?

—একটু ইস্টিশানে যাবা।

—কোথায় যাবা ?

—বেড়াতি যাবা রাণাঘাটের দিকি।

—তামাক খাও বসে।

সিঁদুরচরণ তামাক খেতে বসল। কাছেই একটা বাঁশনি বাঁশের ঝাড়—সিঁদুরচরণ সেদিকে চেয়ে ভাবলে—এই বাঁশনি বাঁশের ঝাড়টা এদেশে, আবার অন্য দেশেও গিয়ে কি এমনি দেখা যাবে ?সে আবার না জানি কি রকম বাঁশনি বাঁশ ! এই রকম কেঁচো, এই রকম কচুর ফুল কি অন্যজায়গাতেও আছে ?দেখতে হবে বেড়িয়ে। সত্যি, বড় মজা দেশবিদেশে বেড়ানো !

সিঁদুরচরণ স্টেশনে পৌঁছবার কিছু পরে টিকিটের ঘণ্টা পড়ল ঢং ঢং করে। একজন ওকে বললে—যাও গিয়ে টিকিট করো। গাড়ি আসচে।

টিকিটের জানলায় গিয়ে ও বললে—ও বাবু, একখানা টিকিস্ দ্যান মোরে—

—টিকিটবাবুবললে—কোথাকার টিকিট ?

—দ্যান বাবু, রাণাঘাটেরই দ্যান আপাতোক একখানা।

গাড়িতে উঠে সিঁদুরচরণের ভীষণ আমোদ হল। সে আমোদ রূপান্তরিত হল বার বার ওর ধূমপান করবার ইচ্ছায়। ঘন ঘন বিড়ি খায়, এই ধরায়, এই খায়। কয়েকটি বিড়ি খেতে খেতেই রাণাঘাটে গাড়ি এসে পড়াতে ও আশ্চর্য হয়ে পড়ল। ষোলো মাইল রাস্তা যে এত অল্প সময়ে এসে পড়বে, তা ও ভাবেইনি।

রাণাঘাটে নেমে এখন কোথায় যাওয়া যায় ?এমন অনেক দূরে যেতে হবে, যেখানে কখনো সে যায়নি।

স্টেশনের এপারে একটা উঁচুমতো রোয়াক-বাঁধানো জায়গা খুব লম্বা। তার দুধারে রেল লাইন পাতা। সেই লম্বা রোয়াকের ওপর লম্বা একটা টিনের চালা। অত বড় টিনের চালার তলার বা রোয়াকটার অন্যদিকে লোকে পান বিড়ি, চা, খাবার ইত্যাদি বিক্রি করচে—লোকজনে কিনচে। যেন একটা মেলা বসে গিয়েচে। মড়িঘাটায় গঙ্গাস্নানের যোগের সময় এ রকম মেলা সে দেখেচে।

একদল উত্তরে লোক তার সঙ্গে একই ট্রেন থেকে নেমে বিড়ি টেনে আড্ডা জমিয়েচে টিনের চালার নীচে। ও সেখানে গিয়ে বললে—কনে যাবা ?

তারা বললে—মুকসুদাবাদ; বেলডাঙা !

—সে কনে ?

—উত্তুরে।

—কোথায় গিয়েলে ?

—পাট কাচতে গেছলাম ওই কানসোনা, তালহাটি, মেহেরপুর।

মেহেরপুর গ্রাম সিঁদুরচরণের বাড়ির কাছে। লোকগুলো সেখান থেকে আসছে শুনে সিঁদুরচরণের মনে হল এই দূর বিদেশ-বিভুঁয়ে এরাই তার পরম আত্মীয়। সে বললে—মেহেরপুরের নসিবন্দি সেখরে চেন ?

—তেনার বাড়িতেই তো ছিলাম আমরা। বছর বছর তেনার পাট কাচি। পত্তর দিয়ে আমাদের তিনি নিয়ে আসে।

—মুইও তারে খুব চিনি।

—আপনি কতদূর যাবা ?

—বেড়াতে বেরিইচি, যতদূর যাওয়া যায় ততদূর যাব।

ওদের মধ্যে একজন বললে—তবুও কদ্দূর যাওয়া হবে ?আমার সঙ্গে বাহাদুরপুর চলো, আমি সেখানে যাব।

—সে কনে ?

—কেষ্টলগর ছাড়িয়ে।

—তবে পয়সা নিয়ে মোর টিকিটখানা তোমার সঙ্গে করে নিয়ে এসো ভাই।

—দ্যাও টাকা।

—কত নগবে ?

—এগারো আনা।

আধঘণ্টা পরে লোকটা টিকিট কেটে এনে তার হাতে দিল। সিঁদুরচরণ পুঁটলির মধ্যে থেকে কাতুর দেওয়া ধুপি-পিঠে খেতে লাগল এবং তার সঙ্গীকে দিলে। ধুপি-পিঠে আর কিছুই নয়, শুধু চালের গুঁড়োর পিঠে, জলে সিদ্ধ। গুড় দিয়ে ভিন্ন সে কঠিন ইঁটের মতো জিনিস গলা দিয়ে নামে না—কিন্তু গুড় সে সঙ্গে করে আনেনি কাপড়চোপড়ে লেগে যাবে বলে। ওর সঙ্গী বল্লে—একটু রসগোল্লার রস কিনে আনব ?এ বড্ড শক্ত !

—হ্যাঁগা উত্তরের গাড়ি কখন আসবে ?

—এই এল। তামুক খেয়ে ল্যাও তাড়াতাড়ি।

একটু পরে আরাম করে বসে ওরা তামাক খেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে উত্তরের অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের ট্রেন এসে হাজির। চা, পান, পাঁউরুটির ফিরিওয়ালাদের চিৎকারে প্ল্যাটফর্ম মুখরিত হয়ে উঠল। যাত্রীরা ইতস্তত ছুটাছুটি করতে লাগল গাড়িতে ওঠবার চেষ্টায়। হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় সিঁদুরচরণের হাত ধরে টেনেহিঁচড়ে তার নতুন সঙ্গী তাকে একটা কামরায় ওঠালে।

গাড়ি রাণাঘাট ছেড়ে দিলে। সিঁদুরচরণ এক কল্কে তামাক সেজে হাঁপ ছেড়ে বললে— বাবাঃ—এর নাম গাড়ি চড়া ?কি কাণ্ড।

সিঁদুরচরণের মনে হল কাতুকে কতদূরে ফেলে সে অজানা বিদেশ-বিভুঁইয়ের দিকে চলেচে। নাএলেই যেন ছিল ভালো। কে জানে বাড়ির বার হলেই এসব হাঙ্গামা ঘটবে ?বিদেশের লোক কি রকম তারই বা ঠিক কি ?তার টাকা ক'টা কেড়ে নিতেও পারে !

তার সঙ্গী তাকে বলে বলে দিচ্চে—এই উলো, এই বাদকুল্লো, এই কেষ্টলগর।

—কেষ্টলগর ?কই দেখি দিকি ! নাম শোনা আছে বহুৎ দিন যে !

সিঁদুরচরণ বিশেষ কিছুই দেখতে পেলে না। গোটাকতক টিনের গুদোম, খানকতক ঘোড়ার গাড়ি, দু-চারটি কোঠাবাড়ি। তাই দেখেই সে মহা খুশি। মস্ত জায়গা কেষ্টনগর। দেশে ফিরে গল্প করার মতো কিছু পাওয়া গেল বটে। কাতুকে নানা ছাঁদে গল্প শোনাতে হবে বাড়ি ফিরে।

আরো একটা স্টেশন গেল। পরের স্টেশনেই বোধ হয়—তার সঙ্গী বললে—নামো, নামো, বাহাদুরপুর।

সিঁদুরচরণ বোঁচকা নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়; সে চেয়ে দেখে—ধু ধু মাঠের মধ্যে ছোট্ট স্টেশন—চারিধারে কূলকিনারা নেই এমন বড় মাঠ। দূরে দূরে দু-চারটে তালগাছ, বাঁশবন।

সিঁদুরচরণের বুকের মধ্যটা হু-হু করে উঠল।

কোথায় কাতু, কোথায় তাদের মালিপোতা। সব ফেলে সে আজ এ কোথায় কতদূরে এসে পড়েচে !

মনে মনে বললে—অ্যান্‌ধরা বিদেশেও মানুষ আসে ! ভগবান, এ তুমি কোথায় নিয়ে ফেললে মোরে !

ওর সঙ্গী বললে—চলো।

—ও বলে—কনে যাব ?

—মোদের গাঁয়ে চলো। এখেন থেকে দু-কোশ পথ।

—সেখানে যাব ?

—যাবা না তো এখানে থাকবা কোথায় ?খেতে-দেতে হবে তো ?

—কি নাম তোমাদের গাঁর ?

—গোয়ালবাথান। নাগরপাড়া।

অগত্যা সিঁদুরচরণ চলল নাগরপাড়া, তার নতুন সঙ্গীর বাড়ি। ক্রোশ দুই হাঁটবার পরে এক গাঁয়ে ঢুকবার মুখেই ছোট্ট চালাঘর। সেখানে গিয়ে তার বন্ধু বললে—এই মোদের বাড়ি ! ভাত-পানি খাও, হাত-মুখ ধোও।

সিঁদুরচরণ বললে—ভাত-পানি খাব কি, মুই কনে এসে পড়েচি তাই শুধু ভাবতি লেগেচি।

—কদ্দূর আসবা আবার !

—কোথায় ছেলাম আর কনে আলাম ! উঃ, এ পিরথিমির কি সীমেমুড়ো নেই ?হ্যাঁগা, আর কদ্দূর আছে ইদিকি ?

—আরে তুমি কি পাগল নাকি ! কী বলে আর কী করে ! ল্যাও ভাত-পানি খাও।

ভাত খেয়ে সিঁদুরচরণ গ্রামের মাঠের দিকে বেড়াতে গেল।

বড় বড় মাঠ, দূরে তালগাছ। এতবড় মাঠ তাদের দেশে সে কখনো দেখেনি, আর চারিদিকেই আকের খেত। উ-ই কি-একটা গ্রাম দেখা যায় ! ওর পরও পিরথ্মি আছে ওদিকে ?বাব্বাঃ !

একজন লোককে বললে—হ্যাঁগা, ইদিকে এত আকের চাষ কেন ?

—কেন, বেলডাঙায় চিনির কল আছে ! আক সেখানে মণ দরে বিক্রি হয় গো—

সব আক ?

—এ কী আক তুমি দেখচো, বেলডাঙার ওদিক ষাট সত্তর একশো বিঘের এক এক বন্দ, শুদ্দু আক !

ওর বন্ধুর বাড়িতে দিন দুই থাকার পরে আকের জমির মজুর দরকার হয়ে পড়ল। ওদের পরামর্শে সিঁদুরচরণও আকের ক্ষেতে আক কাটবার কাজে লেগে গেল। আট আনা রোজ। সিঁদুরচরণদের দেশে মজুরের রেট সওয়া পাঁচ আনা। সে দেখলে মজুরির রেট বেশ ভালোই। দুদিনে একটা টাকা রোজগার, হবেই বা না কেন ?কোন্ দেশ থেকে কোন্ দেশে এসে পড়েচে—এখানে সবই সম্ভব !

নাগরপাড়ার ওপারে বোরগাছি, তার পাশে ধুব্লি। এই দুই গ্রাম থেকে অনেক মজুর আসত আকের ক্ষেতে কাজ করতে। ওদের মধ্যে একজনের সঙ্গে সিঁদুরচরণের খুব ভাব হয়ে গেল। সে বললে—আমাদের গেরামে যাবা ?সেখানে ঘোষ মোশায়দের বাড়িতে একজন কিষাণ দরকার। দশ টাকা মাইনে, খাওয়া-পরা।

সিঁদুরচরণের কাছে এ প্রস্তাব লোভনীয় বলে মনে হল। তাদের দেশে কৃষাণদের মাইনে মাসে পাঁচ টাকার বেশি নয়, খাওয়া-পরার কথাই ওঠে না সেখানে। এবার পাটের দাম বেশি হওয়াতে কৃষাণদের রেট এক টাকা বেড়েচে মাসে—তাও কতদিন এ চড়া রেট টিকবে তার ঠিক নেই। হাতে কিছু টাকা করে নেওয়া যায় এদেশে থাকলে। কিন্তু এতদূর বিদেশে সে থাকবে কতদিন ?

সে জবাব দিলে—না ভাই, আমার যাওয়া হবে না।

—চাকরি করবা না ?

—মরতি যাব কেন বিদেশে পড়ে ?মোদের গাঁয়ে চাকরির অভাব কী ?

খেয়েদেয়ে হাতে দুপয়সা জমেছে যখন, তখন পরের চাকরি করতে যাবার দরকার নেই। রোজ রোজ মজুরি চলে। আজকাল একদিনও সে বসে থাকে না। ভালো একখানা রঙিন গামছা কিনে ফেললে তেরো পয়সা দিয়ে বাহাদুরপুরের হাটে একদিন।

রঙিন গামছাখানাই হল কাল—এখানা কিনে পর্যন্ত তার কেবলই মনে হতে লাগল কাতু যদি তাকে এ গামছা-কাঁধে না দেখল তবে আর গামছা কেনার ফলটা কি ?সবুজ গামছাখানা তো সেদিন কিনেছিল সে কাতুর জন্যে !

একদিন কাজকর্ম সেরে বিকেলে সে মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েচে। একটা বড় ঘোড়া-নিমগাছ ছায়া ফেলেচে অনেকখানি ফাঁকা মাঠে। সেখানে বসে চুপি চুপি কোমর থেকে গেঁজে খুলে পয়সাকড়ি উপুড় করে সামনে ঢেলে গুনে দেখলে, উনিশ টাকা তেরো আনা জমেচে মজুরি করে।

সামনে একটা খালে তেরো-চোদ্দ বছরের সুন্দরী মেয়ে শামুকগুগলি তুলচে। ও বললে—কি তোলচো, ও খুকি ?

মেয়েটা বিস্ময়ের সুরে বললে—কি ?

—তোলচো কী ?

—গুগ্লি।

—কিহবে ?

মেয়েটি সলজ্জহাস্যে বললে—খাব।

—কি জাত তোমরা ?

—বাউরি !

—বাড়ি কনে ?

মেয়েটি আবার ওর দিকে যেন খানিকটা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে আছে—তারপর আঙুল দিয়ে দূরের দিকে দেখিয়ে বললে—নটবরপুর।

আর কোনো কথা হয় না। মেয়েটা আপনমনে গুগলি তুলতে থাকে। সিঁদুরচরণ বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কাতুর কথা বড় মনে হয়, আর থাকা যায় না। এ কোন্ মুল্লুক, কতদূর, বিদেশ-বিভুঁই, সেখানে বাউরি বলে জাত বাস করে। কেউ বাপ-পিতেমোর জন্মে শুনেচে বাউরিবলে কোনো জাতের কথা, যারা খালে বিলে গুগলি তুলে খায় ?

ওর মনটা হু-হু করে ওঠে নতুন করে। বুকের মধ্যে কী যেন একটা মোচড় খায়। যদি এই বিদেশে মারা যায় ?

কাতুর সঙ্গে তাহলে দেখাই হবে না।

কাতু সজনে-তলায় গোরু বেঁধে বিচুলি কেটে দিচ্চে, সন্দের পিদিম ঘরে ঘরে সবে জ্বালা শুরু হয়েচে, এমন সময় রাস্তা কাঁপিয়ে রব উঠল—বল হরি হরিবোল ! ব্যাপারটা নতুন নয়—এই পথ দিয়েই দূর দেশের সমস্ত মড়া পোড়াতে নিয়ে যায় কালীগঞ্জের বা চাদুড়ের গঙ্গাতীরে।

কাতুদের পাড়ার কে একজন জিজ্ঞেস করলে—কনেকার মড়া ?

—সনেকপুর।

—কি জাত হ্যাঁগা ?

—সনেকপুরের বিপিন ঘোষের নাম শুনেচ ?তেনার ছেলে। কাতু বিপিন ঘোষের নাম শোনেনি, কিন্তু বড় কষ্ট হল শুনে। কারো জোয়ান ছেলে মারা গেল—বাপ-মায়ের কী কষ্ট ! এ লোক যে কোথায় গেল আজ মাসখানেকের ওপর হবে তা কেউ জানে না। খবর-পত্তর কিছুই নেই। শিবির মা গাই দুইতে এসে দেখলে ও চালাঘরের ছেঁচতলায় বসে কাঁদচে। শিবির মা অবাক হয়ে বললে—কানচিস কেন রে ?

—মনটা বড্ড কেমন করচে।

—দূর ! বাছুরটা ধর, ইদিক আয় দিনি !

—একটা মড়া নিয়ে গেল দেখলি ?বিপিন ঘোষের ছেলে !

—নিয়ে গেল তো তোর কি ?মর্ মাগী ! বাছুর ধর, এখুনি পিইয়ে যাবে !

শিবির মা পাড়ায় গিয়ে রটিয়ে দিলে সিঁদুরচরণ কাতুকে ফেলে পালিয়েছে। আর আসবে না, এতদিনে বোঝা গেল। অনেকে সহানুভূতি দেখালে। কেউ কেউ বললে—বিয়ে করা সোয়ামী নয়তো ! গিয়েছে তা কী হবে ?গোরুটা রয়েচে, অমন ভাব বক্‌না বাছুরটা হয়েচে, ওরই রইল।

আরো দিন-পনেরো কাটল...

কাতুর চোখের জল শুকোয় না। রোজ সন্ধেবেলা মন হু-হু করে। এমন বক্‌নাবাছুর হল গোরুটার, বার দোয়া শেষ করে আজ সেই গোরু দেড় সের দুধ দিচ্চে দুবেলায়—ও এসে দেখুক। নইলে ঘরে আগুন ধরিয়ে সে চলে যাবে একদিকে, যেদিকে দুচোখ যায়।

পাড়ার ছিচরণ সর্দার আজকাল ওর বাড়ি বড় যাতায়াত শুরু করেচে। ঠিক যে সময়টিতে কেউ থাকে না, ভর-সন্ধেবেলাটি, বাঁশবনে রোদ মিলিয়ে গিয়েচে—ছিচরণ এসে বলবে—ও কাতু !

—কি ?

—ঘরে আছিস্ ?

—কেনে ?

—একটু তামুক খাওয়া।

—তামুক নেই গো।

—পান সাজ্ একটা।

—পান কনে পাব ?মানুষ ঘরে না থাকলি ও-সব থাকে ?তুমি এখন যাও।

ছিচরণ সর্দার দমবার পাত্র নয়। তার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে আজ দু'বছর। অবস্থা ভালো, একআউড়ি ধান ঘরে তুলেচে গত ভাদ্র মাসে। এবার চড়া পাটের বাজারে ত্রিশ মণ পাট-বিক্রি করেচে। লোকে খাতির করে চলে ওকে। শিবির মা রোজ গাই দুইতে এসে ছিচরণের ঐশ্বর্যের ফিরিস্তি কাতুকে শুনিয়ে যায় অকারণে। ছিচরণ নিজে দু-একদিন অন্তর আসে; বসতে না বললেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গল্প জমাবার চেষ্টা করে। কাতুর ভালো লাগে না এ-সব। আর কিছুদিন সে দেখবে—তারপর গোরু-বাছুর বিক্রি করে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়বে একদিকে।

সেদিন ছিচরণ আবার এসে হাজির। ডাক দিলে—ও কাতু !

—কি ?

—বাবাঃ, তা একটু ভালো করে কথা বললি কি তোর জাত যাবে ?

—তুমি রোজ রোজ ভর্-সন্দেবেলা এখানে আসো কেন ?

—তার দোষটা কি ?

—না, তুমি এসো না। লোকে কি মনে করবে !

—একটা কথা বলি তোর কাছে। আমার সংসারডা তো গিয়েচে তুই জানিস। একা থাকতি বড্ড কষ্ট হয়।

—তা কি করব আমি ?

ছিচরণের আর বেশি কথা বলতে সাহস হল না, আমতা আমতা করে বললে না, না—তাই বলচি।

কাতু বললে—এখন তুমি এসো গিয়ে।

ছিচরণ তবুও যায় না। বলে—ওরে দাঁড়া ! যাব, যাব, থাকতি আসিনি। এই দু-বিশ ধান কর্জ দেলাম পাঁচুরে। বলি হয়েচে দেড় পৌটী ধান, তা লোকের উপকারে লাগে তো লাগুক। ধান ঝেড়ে দিয়ে-থুয়ে এই আসচি। বড্ড কষ্ট হয়েচে আজ।

কাতু ঝাঁঝাল সুরে বললে—কষ্ট জুড়োবার আর কি জায়গা নেই গাঁয়ে ?

—তোর সঙ্গে দুটো কথা বল্লি আমার মনডা জুড়োয়, সত্যি বলচি কাতু। তোরে দেখে আসচি ছেলেবেলা থেকে। আমি যখন গোরু চরাই তখন তুই এতটুকু। তোর বয়েস আমার চেয়ে সাত আট বছরের কম।

—বেশ, তা এখন যাও। বয়েসের হিসেব কসতি কে বল্চে তোমারে ?

—হ্যাঁরে, সিঁদুরচরণ তোরে ফেলে এমনিই পালাল, না পয়সাকড়ি কিছু দিয়ে গিয়েচে ?চলা-চলতির একটা ব্যবস্থা চাই তো ?

—সেজন্যি তোমার দোরে গিয়ে কেঁদে পড়েলাম মুই, জিজ্ঞেস করি ?

ছিচরণ বেগতিক দেখে আস্তে আস্তে চলে গেল। কাতু কাঁদতে বসল। তার বয়েস হয়েচেএকথা সত্যি, প্রায় পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, কি তার চেয়েও বেশি। ঘরসংসার বলে জিনিসের মুখ এই ক'বছর দেখেচে, সিঁদুরচরণের কাছে থেকে। আবার কোথায় যাবে এই বয়সে ?একটা পেট চলে যাবে, ভিক্ষে করা কেউ কেড়ে নেবে না। দুদিনের গেরস্থালি ভেঙে যদি যায়—আর কোথাও গেরস্থালি বাঁধবে না, সব ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বে।

শিবির মা এসে দোরে দাঁড়াল। কাতু জানে, ও কেন আসে। আসে একটা নিয়ে অবিশ্যি।বললে—একটু হলুদবাটা দেবা ?

—নিয়ে যাও।

—দু'সের হলুদ এনেছিলাম ছিচরণ সর্দারের বাড়ি থেকে। তা ফুরিয়ে গিয়েচে। ওর ঘরে কোনো জিনিসের অভাব নেই। হলুদ বলো, ঝাল বলো, পেঁজ বলো, সরষে বলো—সব মজুদ। গুড় আমাদের দেয় বছরে একখানা করে। ওর ঘরে চার-পাঁচ মণ গুড় হয় ফি-বছর।

কাতু বললে—তা এখন হলুদ-বাটনা নেবা ?

শিবির মা বললে—হলুদ-বাটনা দ্যাও একটু। মাছ রাঁধব।

—তবে নিয়ে যাও।

—তোমার শরিল খারাপ হলি দেখাশোনা করে কে ভাই ভাবছি।

—সে ভাবনা তোমায় ভাবতি কেডা গলা ধরে সেধেচে শুনি ?গা-জ্বালা কথা শুনলি হয়ে আসে !

ঠিক সেই সময় উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কে ডাক দিলে—ও কাতু !

কাতু চমকে উঠেই পরক্ষণে দাওয়া থেকে ছুটে নেমে এসে বললে—তুমি ! ওমা, আমি কনে যাব !

শিবির মা অন্য দিক দিয়ে পালানোর পথ খুঁজে পায় না শেষে।

এই হল সিঁদুরচরণের বিখ্যাত ভ্রমণের ইতিহাস। এর পর থেকে মালিপোতা গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত ভ্রমণকারী বলে সে গণ্য হয়ে রইল। দশবার ধরে এ গল্প করেও তার ভ্রমণকাহিনী আর ফুরোয় না। লোকে আঙুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে বলে—ওই লোকটা বাহাদুরপুর গিয়েল ! জোয়ান বয়েসে ও বড্ড বেড়িয়েচে দেশ-বিদেশে !

অবিশ্যি সিঁদুরচরণকে দেখতে নিতান্ত সাধারণ লোকের মতোই। তার মধ্যে যে অত বড় গুণ লুকিয়ে আছে তা তাকে দেখে বোঝবার উপায় ছিল না। মানুষের কীর্তিই মানুষকে অমর করে।

সিঁদুরচরণের খ্যাতি আমার কানেও গিয়েছিল। ঝুম্‌রির বাগানের মধ্যে দিয়ে সিঁদুরচরণ হাট থেকে সেদিন ফিরচে, আমি বল্লাম—সিঁদুরচরণ নাকি বাহাদুরপুর গিয়েছিলে ?

সিঁদুরচরণ বিনম্র হাস্যের সঙ্গে বললে—তা গিয়েলাম বাবু। অনেকদিন আগে।

—বটে। আচ্ছা, সে কতদূর ?

—আপনি কেষ্টলগর চেনো ?

—না চিনলেও নাম শোনা আছে !

—কোন্ দিকে জানো ?

—তা কি করে জানব, আমি কি সেখানে গিয়েচি ?

—বাহাদুরপুর কেষ্টলগরের দু'ইস্টিশনের পরে।

কথা শেষ করেই সিঁদুরচরণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, বোধ হয় এই দেখবার জন্য যে, তার কথা শুনে আমার মুখের চেহারা কি রকম হয়।